Bhaswati Roychowdhury (Basu)

(1)

Knowledge of Paluskar Notation System,

সঙ্গীতের সুরকে স্বর এবং ছন্দগুলি সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা লিখে বোঝানোর প্রক্রিয়াকে 'স্বরলিপি' বা Notation বলে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে দুই প্রকার স্বরলিপির ব্যবহার হয়ে থাকে। (১) পালুস্করের স্বরলিপি (২) ভাতখণ্ডে স্বরলিপি।

পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পালুস্করের স্বরলিপির রূপ হল—

(১) শুদ্ধ স্বর – সা রে গ ম প ধ নি
(২) বিকৃত স্বর – রে. গ\ ম. ধ. নি.
(৩) মন্দ্র স্বর – নিং, ধং, পং
(৪) তার-স্বর – সা̍, রে̍, গ̍
(৫) মীড়ের চিহ্ন – মধ
(৬) একমাত্রার স্বর – 'সা', হাফ মাত্রা – 'সা' (০), সিকি মাত্রা – 'সা', দেড় মাত্রা – সা০, দুই মাত্রা – 'সা' (ঽ), চারমাত্রা – 'সা' (×) — এইরূপ চিহ্ন দ্বারা স্বরের স্থায়িত্ব বোঝানো হয়।
(৭) স্পর্শ স্বর বা কণ স্বর – মূল স্বরের বাম দিকে মাথার উপরে ছোট করে স্বরটি লেখা হয়। যেমন মপ
(৮) বক্র কম্বনীর মধ্যে স্বর থাকলে অর্থাৎ (প), তা বোঝানো হয় মধপধপ বা ধপমপ এইভাবে এবং এটি এক মাত্রার অন্তর্গত হবে।
(৯) গানের কথার অক্ষর এবং স্বরের প্রলম্বিত অক্ষর বোঝানো হয়
ম ঽ প ঽ
বং ০ শী ০ } এইভাবে।
(১০) সম-এর চিহ্ন '১', ফাঁক বা খালির চিহ্ন '+' এবং অন্যান্য বিভাগের তালিগুলি মাত্রার সংখ্যা দিয়ে বোঝানো হয়, এবং চিহ্নগুলি স্বরলিপির নিচের দিকে লেখা হয়।
(১১) তাল বিভাগের চিহ্ন – স্বরের পাশে দাঁড়ি (।)।

(2)

Hindusthani Notation System

হিন্দুস্থানী স্বরলিপি পদ্ধতির প্রবর্তক হলেন পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে। তাঁর রচিত স্বরলিপির রূপ হল —

(১) শুদ্ধ স্বর — সা রে গ ম প ধ নি
(২) বিকৃত স্বর — রে̱ গ̱ ম' ধ̱ নি̱
(৩) মন্দ্র স্বর — নি় ধ় প়
(৪) তার স্বর — সা̇ রে̇ গ̇
(৫) মীড়ের চিহ্ন — সা⁀ম
(৬) কণ্‌ বা স্পর্শ স্বর — $^{\text{গ}}$ম
(৭) এক মাত্রায় দুটি বা তিনটি স্বর — সারে, সারেগ
(৮) কণীর মণ্ডিত স্বর — (প) অর্থাৎ মপধপ বা ধপমপ
(৯) তাল বিভাগের চিহ্ন — দাঁড়ি (।)
(১০) সম-এর চিহ্ন 'X', ফাঁক বা খালির চিহ্ন '0', অন্যান্য তালাঘাতগুলি 2, ৩, ৪ মাত্রাসংখ্যা দ্বারা বোঝানো হয় এবং স্বরলিপির নীচে চিহ্নগুলি লেখা হয়।

Knowledge of different style of Bengali Songs: Kabigaan, Akhrai, Tarja, Panchali & Dhop-Kirtan.

বাংলা সঙ্গীতের মধ্যযুগে অর্থাৎ ১৮-শ শতক থেকে বাংলার নিজস্ব সঙ্গীত মঙ্গল, পাঁচালী, যাত্রা, কবিগান, তরজা, খেউর, খেমটা আখড়াই, মালসী, বাউলী প্রভৃতির প্রচলন শুরু হয়, যা বাংলার এক একটি প্রান্তের প্রাকৃতিক সুর, লোকগীতি, গ্রাম্য মেঠো গান থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

কবিগান

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলকাতার বিত্তবান সমাজের রুচি-সম্পন্ন এক ধরনের লঘু সঙ্গীত হল কবিগান, শিক্ষিত না হয়েও শুধুমাত্র প্রতিভার জোরে সভায় দাঁড়িয়ে তৎক্ষণাৎ গান রচনা করে তা পরিবেশন করতেন এই কবিয়ালরা। দুটি দল ঈশ্বর ভিত্তিক রচনা দিয়ে গানের আসর শুরু করতেন প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে যা 'চাপান' ও 'উতোর' নামে পরিচিত। পরে দু-পক্ষের অশ্লীল ভাষার ব্যবহারে গালাগালিতে রূপান্তরিত হতো। কবি গায়কদের সবচেয়ে বড় গুণ হল উপস্থিত বুদ্ধি ও ভাষার চটকদারিতা। সেইসঙ্গে ছন্দজ্ঞান, সুরজ্ঞান ও শাস্ত্র বিষয়ে জ্ঞানদান, ঢোল ও কাঁসি সহযোগে এই গান গাওয়া হতো। কয়েকজন বিখ্যাত কবিওয়ালাদের মধ্যে ভোলা ময়রা, নিতাই বৈরাগী, হরু ঠাকুর, গোঁজলা গুঁই, রাম বসু, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পাঁচালীগান

এক ধরনের অশিক্ষিত কবিরা বিকৃত সামাজিক পরিবেশে আসর জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে নানা ছন্দে গাঁথা করে পায়ে নূপুর ও হাতে চামর, মন্দিরা নিয়ে যে গান গাইতো তার নাম ছিল পাঁচালী। পুরাতন বাংলা সাহিত্যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ, লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল — সব কয়টিই ছিল পাঁচালী। সভাস্থলে দাঁড়িয়ে আবৃত্তির আকারে সুর করে পাঠ করা হতো। প্রাচীনকালে পুতুল নাচের সহযোগে যে গান গীত হত তাকেই পাঁচালী নামে অভিহিত করা হয়। এই গানে রাগরাগিনী মধ্যে সিন্ধু, ভৈরবী, জয়জয়ন্তী এবং ঝাঁপতাল, মধ্যমান ইত্যাদি তাল ব্যবহৃত হয়েছে। পাঁচালীকারদের মধ্যে অন্যতম হলেন দাশরথি রায়, কৃষ্ণকমল গোস্বামী, ঠাকুরদাস দত্ত, রসিকচন্দ্র রায়, ঈশ্বর গুপ্ত, সন্ন্যাসী চক্রবর্তী প্রমুখ।

আখড়াই

অল্প শিক্ষিতদের মধ্যে প্রচলিত রাগ সঙ্গীত, যা রাজা নবকৃষ্ণের সভাসদ কুলুইচন্দ্র সেন রাগরাগিনী সন্নিবেশিত করে যন্ত্রের প্রয়োগ ঘটিয়ে আখড়ার অর্থাৎ আড্ডা ঘরের উপযোগী করে তোলেন, এই গানে সুর ও রাগের পরিমাণ) এবং বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োগ খুব জটিল ছিল, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় না থাকলে এই গান শেখা বেশ কষ্টসাধ্য, কুলুইচন্দ্র সেন এই গানে ধ্রুপদের আলাপ, সুরের বৈচিত্র্য ঘটান, পরবর্তীকালে রামনিধি গুপ্ত কর্তৃক পরিমার্জিত ও অভিজাত স্তরে উন্নীত হয়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে শ্রীদাম দাস, রামপ্রসাদ ঠাকুর, নসীরাম সেকরা এই গানে খ্যাতিলাভ করে।

তরজা

ষোড়শ শতাব্দীতে কবিগানের মতো এক প্রকার ভক্তিমূলক পল্লীগীতি-এর রচনা সম্পর্কে জানা যায় যা 'তরজা' নামে পরিচিত, চড়ক, গাজন ইত্যাদি লৌকিক অনুষ্ঠানে ঢোল, কাঁসি সহযোগে উত্তর-প্রত্যুত্তরের মাধ্যমে এই গান গাওয়ার প্রচলন ছিল, কেউ কেউ মনে করেন আরবীয় তরজীবন্দ শব্দের বিবর্তিত সংস্করণ হলো 'তরজা'।

ঢপ কীর্তন

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এক প্রকার লঘুরীতির কীর্তন হল ঢপ-কীর্তন যা পাঁচালী ও কীর্তনের মিশ্রণে রচিত গান, যশোর বাসী (বর্তমানে বাংলাদেশে) মধুসূদন কিন্নর বা মধুকান নামে এক গায়ক এই গানের প্রবর্তন করেন, বৈষ্ণবী গানের হালকা সুর, তাল, লয় প্রয়োগ করে, উক্তির অলংকরণ যুক্ত করে এই গান গাওয়া হত।